অনেক বুড়ো অথর্ব লোকেরা এক্সটেনশন পাচ্ছে। কোন কাজে লাগছে আমার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার? এখন মেডেলটি ধুয়ে পানি খাব? বড় খেলোয়াড় না হয়ে বড় ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী হলেই ভাল হত।" তাঁর বলার ভঙ্গীতে কথাগুলোয় কোন ক্ষোভ ছিল না। কোন বিদ্রূপ দেখাননি। শুধু একটি সময় ও অবস্থাকে অতিসহজে মাপার চেষ্টা করলেন। দারুণভাবে অবাক হয়েছিলাম, যখন শুনলাম তাঁর একমাত্র মেয়ে চাকরি থেকে অবসরের খবর পেয়ে বাবাকে প্রশ্ন করেছিল, আমরা এ বাসা ছেড়ে দিলে আমি কোথায় থেকে লেখাপড়া করব? কাস্টমসে একমাত্র রাষ্ট্রীয় পদক পাওয়া ব্যক্তিত্বটি চাকরির ভারে কখনও নুইয়ে পড়েননি। যে নিষ্ঠা ও মায়া আর মমতাভরা পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আরজু ভাই কাস্টমসে চাকরি করে এলেন তা অবসরকালীন আইনের বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছেন বলা যায়। কারণ এটাইতো নিয়তি। তবে ভাবতে হবে যে, এটা কতটা জাতীয় উদ্দীপনা ও আদর্শের স্বার্থে স্বাভাবিক। হয়ত তার পরিমাপ করা নিরর্থক। এর দ্বারপ্রান্তে এ দেশের আপামর ক্রীড়ামোদী জনসাধারণ যদি ফরিয়াদ রাখতে চায় তা যেন ভবিষ্যতে হাস্যকর না হয় সে আশা তিনি পোষণ করেন। আমাদের স্বার্থপরতার নেশা যখন কাটবে তখন দেখব অনেক দেরী হয়ে গেছে।

১৯৮২ সাল থেকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বন্ধ হয়ে আছে। অথচ নাচ, গান, নাটক, সিনেমা, ছবি আঁকা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ পুরস্কার থেমে রয়নি। খেলাধুলায় এই পুরস্কার পুনঃ প্রচলনে তদবিরের লোকেরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণে ব্যর্থতাই সম্ভবত এক্ষেত্রে একমাত্র প্রতিবন্ধক রূপে চিহ্নিত হলে তা হবে সত্যি দুঃখজনক। খেলায় সর্বোচ্চ পদকের আকর্ষণ না থাকলে অনেক উদীয়মান খেলোয়াড় পয়সার মোহে অন্যদিকে ঝুঁকে পড়ে অকালেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। "সর্বশ্রেষ্ঠ সুনামের পিছনে ছুটার তাগিদ ছিল বলেই একজন খেলোয়াড় হওয়ার গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েছিলাম", বলেন আরজু ভাই। বর্তমানে ক্রীড়ানীতিতেও একটি ধারায় এটি পুনঃ প্রচলনের অভিলাস ব্যক্ত হলেও বাস্তবায়ন নিয়ে প্রবৃত্তি একইভাবে রয়ে গেছে। হয়তো শীঘ্রই এ মেঘ কেটে যাবে।

প্রায় তিন দশক এক নাগারে চিটাগাং—এ থেকে তিনি রাজধানী ঢাকার সঙ্গে খেলাধুলা বিষয়ে অবিরত সংযোগ রেখেছেন। ভাল খেলোয়াড় খুঁজে বের করা, কাস্টমসে চাকরি দেয়া এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ছিল তাঁর নেশা। তিনি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সদস্য পদে প্রায় তিন বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফুটবলে এদেশে এ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত পনের জনকে দিয়ে ফেডারেশনের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলে উপকার কেমন পাওয়া যেত সে বিষয়ে তিনি খুবই আশাবাদী। " বড় খেলোয়াড় বাচ্চুইয়ের মত যোগ্যতাসম্পন্ন সংগঠকদেরও বাছাই করে অভিমত নেয়া খুবই দরকার। আমাদের জাতীয় ও জোনাল সংস্থাগুলিকে একপেশেমির অসুস্থতা এবং সাংগঠনিক স্থবিরতা থেকে সরাতে হবে। লবিং মুখী—ধ্যান ধারণা খেলার জন্যে পঙ্কিলতা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না।"

খেলার খবর পরিবেশকদের বলিষ্ঠতা এবং সত্যনিষ্ঠার কাহিনী বর্ণনা করতে যেয়ে তিনি এ দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিগত বছরগুলিতে খেলাধুলার উপর তাঁর প্রকাশিত লেখাগুলোকে এক ধাক্কায় মুছে দেবার পক্ষপাতী। তিনি বললেন, যাঁরা মাঠে খেলেন এবং যাঁরা কাগজের উপর তার বিবরণ আঁকেন এ দু'দলের মানুষদের একটিই বাস্তবতাকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে। তা হল খেলা ও খেলোয়াড়দের সঠিক পরিচয় তুলে ধরা। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে "আমার ফুটবল খেলোয়াড়ী জীবনে কোন নির্দিষ্ট খেলা মনে লাগার মত নেই। প্রতিটি খেলাই প্রাণ ভরে খেলেছি। কথা প্রসঙ্গে ছাত্র জীবনে এস এম হলের শ্রদ্ধেয় প্রভোস্ট জনাব ওসমান গনির কথা বললেন। 'ম্যাট্রিক ও ইন্টারমেডিয়েট ডবল থার্ড ডিভিশন পেয়ে যখন হলে স্থান পাবনা জেনেও, সিট চাইলাম, প্রভোস্ট সাহেব আমার সেদিনের খেলোয়াড়ী কৃতিত্বকে শুধুমাত্র লেখাপড়ায় মেধাবী ছেলেদের চেয়ে অনেক ভাল মন্তব্য করে, সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে ভাল কক্ষগুলির একটি আমার জন্য বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন এবং পকেট থেকে তখনকার দিনের ৫০ (পঞ্চাশ) টাকার একটি চেক দিয়ে বল্লেন, "যাও কোথাও বাকি টাকি থাকলে মিটিয়ে নাও, আর তোমাকে এম একটা কক্ষ দেওয়া হলো যাতে সারারাত বাতির ব্যবস্থা থাকে—— কক্ষ নং ১৭৯।'

খেলা পাগল মানুষেদের খুঁজে বের করে কাজে লাগাবার কারো গরজ নেই। দেশের সমগ্র ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা একধরনের গতানুগতিকতার উপর নির্ভর করে চলছে। এক জাতীয় চিন্তাধারা খেলায় সংযোজন করে সস্তা বাহবা নিতে অনেকেই ব্যস্ত থাকেন। যেন বহু দূর থেকে ইসরাফিলের সিঙ্গা ফুৎকার মত কথাগুলো ভেসে আসছিল আরজু ভাইয়ের মুখ থেকে। মানুষের ভিড়ে খেলোয়াড়দের আড়ালে তাঁর আগত দিনের ইঙ্গিতটুকু ভিত্তি করে যাঁরা এগিয়ে যাবেন তাঁরা নিশ্চয়ই পাবেন একটি দিক নির্দেশনা।

অন্যদের কথার মধ্যে নিজের পারিবারিক জীবনের খতিয়ান দিতে যেয়ে বলেন যে, তাঁর দু'ছেলের একজনকে বড় ফুটবলার বানাতে চেয়েছিলেন। জাতীয় জুনিয়র দলে ১৯৮০ সালে আরিফ নামের ছেলেটির পরিচয় ছিল। মেধার স্বীকৃতি ছিল। তা সত্বেও স্বার্থপরতা এবং কোন্দলের শিকার হলে আরিফ মনের দুঃখে সরাসরি সুইডেন চলে যায়। সে দেশে ফুটবলকে ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে সেখানেই সে বসতি স্থাপন করে নাগরিকত্ব লাভ করেছে। ছেলের জন্য তিনি আজ গর্বিত।

আরজু ভাই একটি সাধারণ গ্রামের ছেলে। নিজ চেষ্টায় এত বড় ফুটবলার হতে পেরেছিলেন যা সত্যি ভাবিয়ে দেখলে অবাক হতে হয়। এদেশে খেলাধুলায় সুযোগ পেলে একই ভাবে ক্রীড়া সংগঠনে যাঁরা অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারতেন, নতুন ধ্যান-ধারণায় ক্রীড়াঙ্গন ভরে দিতে পারতেন, ক্রীড়ার ভিত মজবুত করতে পারতেন আরজু তাঁদেরই একজন। একটি অকৃত্রিম সত্তা নিয়ে তিনি চলেন বন্ধু ও পরিচিত মহলে তাঁকে সকলে ভালবাসেন। সকলেই শ্রদ্ধা করেন। সে নেশায়ই তিনি সর্বদা বিভোর হয়ে থাকেন। তিনি আজকের খেলোয়াড়দের সঙ্গে যখন কথা বলেন, প্রাণ খুলে যতটা সম্ভব সবকিছুই বলেন। তাঁর কথাতে সত্যিই যেন বিগত দিনের খেলার মাঠের মুক্তা ঝরে। আমাদের মাঝে এ উপলদ্ধিতেই তিনি আজও বেঁচে আছেন। ভবিষ্যতে নিশ্চিত অমর হয়ে থাকবেন। কথায় ও কাজে মাঠে কখনও ফাউল না করে একজন কৃতি, দুর্ভেদ্য ও সুশৃঙ্খল ক্রীড়াবিদ রূপে সর্বদা পরিগণিত হবেন।